দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম সংকলন

বৈশাখ/আষাঢ়

১৩৭৯

সম্পাদনায় — "অভিযাত্রী"

আমাদের কথা

বছর খানেক আগে যে ত্রৈমাসিক 'অভিযান' জন্ম নেয় মাত্র কয়েকজনের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় হাতে লেখা সঙ্কলনের মাধ্যমে, প্রায় একটি বছর কেটে যায় সেই শিশু 'অভিযানের', কলমের খোঁচা খেয়ে। কিন্তু বছর না ঘুরতেই পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন আরও অনেকে তাঁদের পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে। 'খোঁচা লাগা' বস্ত্র ত্যাগ করে অভিযান ধারণ করল 'প্রেস্ড্' বস্ত্র। নতুন বছরের উপলক্ষে দেখা গেল 'অভিযানের' নতুন রূপ। বার হ'ল প্রথম ছাপা সংকলন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এক নতুন আবেদন নিয়ে।

আমাদের এই 'অভিযান' নামের তাৎপর্য্য কি? বহু লোকের মতে জীবনটাই হল এক অভিযান, আমাদের বক্তব্যও অনুরূপ। তাহলে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। এই জীবনটাই যদি অভিযান তবে অন্তিম লক্ষ্য কি মৃত্যু? না, কখনোই নয়। এখানে জীবনকে একক সংখ্যায় বেঁধে রাখলে চলবে না। নিতে হবে ব্যাপক অর্থে—সমগ্র মানব জাতির জীবন হিসাবে। বরং বলা যায় এটা একটা রীলে রেস যা কখনো শেষ হবেনা। এক একটি জীবন এর অংশীদার মাত্র।

প্রকৃতি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলো জ্ঞানের মশাল, আদিম যুগ থেকে প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা করে আসছে মশালের পবিত্র পাবক শিখায় কিছু স্ফুলিঙ্গ আরও যোগ করতে, কারণ প্রত্যেকটি জীবনই

সম্ভাবনাময় এক একটি স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু বহু স্ফুলিঙ্গ এমনও আছে যা কিছু যোগ করার পূর্ব্বেই নিভে যেতে বাধ্য হয় নানান প্রতিকুলতার সাথে সংঘর্ষে। আমাদের উদ্যম এই স্ফুলিঙ্গদের সম্ভাবনা সম্ভব করার জন্য, তাই এর লেখক-লেখিকারা বেশির ভাগই নতুন ধানের সবুজ শীষ। 'অভিযান' হবে এই নতুনদের অভিব্যক্তির মাধ্যম !

× × ×

আমাদের এই বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হতে বেশ কিছু দেরী হল, তার জন্য আমরা দুঃখিত। তবে অকারণে আমরা দেরী করিনি, আমাদের প্রথম ছাপা সংকলন প্রকাশিত করায় আমরা ১লা বৈশাখ অপেক্ষা ২৫শে বৈশাখই বেশী উপযুক্ত দিন মনে করি। ১লা বৈশাখ আমাদের বাঙালীদের নববর্ষের দিন ঠিকই, নিঃসন্দেহে শুভ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ, কিন্তু ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এই দিনটি কেবল বাঙালীর নয় সারা বিশ্বের কাছে বিশ্বকবির জন্মদিন হিসাবে বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ। সুতরাং এই শুভদিনে, সেই অমর কবির প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমরা বার করছি অভিযানের' প্রথম ছাপা সংকলন। বলার আর কিছুই নেই, তবে শেষ করার আগে শুধু এটুকু বলে রাখি যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের সহযোগিতায় এবং আমাদের প্রচেষ্টায় এই সংকলনের উন্নতি এবং বিকাশ সুনিশ্চিত।

"অভিযাত্রী"

বৈশাখ—১৩৭৯

সূচী-পত্র

লেখা

দিতে ইচ্ছুক

ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ

যে, তাঁরা যেন নিম্নলিখিত

ঠিকানায় নিজেদের লেখা পাঠান।

লেখা নিজে এসে অথবা ডাকে পাঠান

যেতে পারে তবে নিজ দায়িত্বে। লেখাকে কোন

গণ্ডীতে বাঁধার পক্ষপাতী আমরা নই তবে লেখার

আঙ্গিকে নতুন কিছু দেওয়ার প্রয়াস থাকা উচিৎ। লেখা

কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া হবে না।

লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠে বড়

হরফে পরিষ্কার ভাবে থাকা চাই।

সম্পাদক মণ্ডলী দরকার বোধ

করলে লেখায় প্রয়োজনীয়

সংশোধন করতে

পারবেন।

– ঠিকানা –

'অভিযান'

কেঃ অঃ শ্রী অশোক বাগচী

জক্কনপুর, পাটনা-১ (বিহার)

ফোন নং ২৪৮৪৯

২১১২০

এদিক ওদিক

চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছি। কোন রকম ভাবনা মাথায় থাকতে পারছে না। এক একটা আসছে আর পিছন থেকে আরেকটা ভাবনার গুঁতো খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার আসছে……ভিয়েৎনামের লড়াই, কিছু দিন আগের বাংলা দেশের অবস্থা এবং কলকাতার অবস্থাও। আরো কত ছোট ছোট ভাবনাগুলো 'পঁয়ষট্টির' লাইনের কচিপাকা ছেলে গুলোর মত মনের মধ্যে ঢোকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছে। সব জায়গায় এখন বৈশাখের শেষ দুপুরের আকাশের মতো ঘন হয়ে আসা কালো মেঘ। আলো কোথাও নেই। কখনো হঠাৎ মেঘ চিরে ফালা ফালা করে বেরিয়ে আসে বিদ্যুৎ চমক, রক্তাক্ত কলেবরে, কিন্তু মুহূর্ত্তেই তা শেষ হয়ে যায়। শুধু রেখে যায় কিছুক্ষণের জন্য মেঘের বুক কাঁপিয়ে দেওয়া বিক্ষুব্ধ গর্জন।

কিন্তু এটা কার মুখ? মনের চোখের সামনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীভৎস দৃশ্যাবলী যথা কতকগুলো ভিয়েৎনামী ছেলে মেয়ের মৃতদেহ, কিছু লাঞ্ছিত নারিত্বের বিমূর্ত চিত্র, আর সবার ওপর ছেয়ে আছে সেই কালো মেঘ। এই সব কিছুর ওপর ছায়া-চিত্রের ডিজল্‌ভ প্রক্রিয়ার মত একটা মুখ ভেসে আসছে। 2 টো স্বপ্নিল চোখে অতলান্তের গভীরতা। এই চোখ যেন হৃদয়ের প্রতীক। সমস্ত ব্যথা, বেদনা, অত্যাচার, ইত্যাদ মানবীয় অবগুণ গুলো সেই অতলান্ত হৃদয়ের নির্ম্মল প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যেতে পারে। এ চোখ তো ভুল

হবার নয়। এযে বিশ্বকবির চোখ। সমস্ত মুখশ্রীতে কবিতার ব্যঞ্জণা। যেন আশ্বাস দিছেন নিপীড়িতকে। গহ্বরে পতিত জনের জন্য ঝুলিয়ে দিচ্ছেন আশ্বাসের দড়ি। দিচ্ছেন আশীর্ব্বাদের অবলম্বন।

কিন্তু বিশ্বকবি, তোমার চোখে ক্ষমা কেন? ভুল করছ বিশ্বকবি। তোমার চোখে আর যাই থাক ক্ষমা যেন না থাকে। ক্ষমার দিন ফুরিয়ে গেছে—

অনেক করেছ ক্ষমা
তুমি এবং তোমরা
এই সব অত্যাচারী,
জান্তব শীৎকারে মত্ত
পাষণ্ডদের।
ক্ষমার যোগ্য তারা,
যারা
প্রবৃত্তির তাড়নায় পাশব আচরনকারী,
যদিও তারা মানুষই।
কিন্তু এরা
এক একটি গলিত শব
যার পারিপার্শ্বিক জগৎ
পূতি গন্ধ ময় সর্বদা।
এদের ধ্বংস করো
তোমার চোখের আগুনে
শেষ হয়ে যাক এই রৌরব।
তখন,
'পড়ে থাকা ছাইয়ে ফুঁ দিলে'
নিশ্চয় পাবো অমূল্য রতন,
মনুর সন্তান; মানুষ।

১৩৭৯ সালের ২৫শে বৈশাখ, আমাদের মনে জন্ম দিক শত শত রবীন্দ্রনাথের—নবরূপে, নবকলেবরে।

× × ×

এবার সামনে লাল রঙের নাকি রক্তের সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিলাম। তার মাঝে একটা আকৃতি, চোখ, ঠোঁট, নাক ইত্যাদির রূপায়ন হচ্ছে। তার চোখে রক্তের সমুদ্র থেকে ভেসে ওঠবার কি ব্যাকুল প্রয়াস। কিন্তু……কিন্তু……ও কি বলতে চাইছে ? আদৌ বলতে চাইছে কিনা তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। কারণ আমি শুধু কয়েকটি কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছি ওর তুই ঠোঁট, জিভ ও দাঁতের।

……আমি পার্সনস্। আমার সঙ্গে আছে স্পাইস্, ফিশার এবং এঙ্গেলস।……চমকে উঠলাম। কোন পার্সনস্ ? এগুলো কাদের নাম ?……মন লাফ দিয়ে বেশ কয়েক ডজন বছর পিছিয়ে গেল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে নিউ ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ধর্মঘটের স্তব্ধতা। চিকাগো শহর বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার জুতা শ্রমিকরা ১৯-২০ ঘণ্টা কাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সুত্রপাত করেছিল, তা ছিল শুধু স্ফুলিঙ্গ। সেই স্ফুলিঙ্গ আশি বছরে রূপ নিয়েছে জ্বলন্ত গনগনে চুল্লির। এ লোহাও গলিয়ে ফেলতে পারে।

১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার জুতা শ্রমিকদের অসফল বিদ্রোহের পর সফলতা আসতে লাগল ১৮২০এর পর থেকে। ১৮৩৪ সালে রুটি কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করল যা কিছু মাত্রায় সফল হয়েছিল। তারপর জন্ম নিল National Union of Labour,

William D'silvaর নেতৃত্বে। এই সংস্থার উদ্যোগেই ১৮৬৬ সালে বালটিমোরে অনুষ্ঠিত হল আমেরিকান শ্রমিকদের সম্মেলন। ১৮৭৫ সালে পেনিসিলভেনিয়ার শ্রমিকরা কয়লা খনিতে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে ধর্মঘট করল। তার ফলে দশ জন শ্রমিক শিকার হল মালিক পক্ষের আক্রোশের। তারা ফাঁসীতে ঝুলল।

এই সব ঘটনার ধাপে ধাপে বিক্ষোভের বারুদস্তূপ বড় হচ্ছিল। তার বিস্ফোরণ ঘটল ১৮৮৬ সালের ১লা মে। পুলিস ও মালিকের মিলিত আক্রোশ পড়ল শ্রমিকদের ওপর। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ৩রা মে বিক্ষোভ আরও বেড়ে উঠল। চলল পুলিসের গুলি। তারপর ৪ঠা মে। আবার চলল পুলিসের গুলি। চিকাগোর হে মার্কেট অঞ্চল শ্রমিকদের রক্তে কর্দ্দমাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেই কর্দ্দম ছিটে গায়ে লেগে চিহ্নিত করে দিল সেই অত্যাচারীদের। তাই তারা রক্তের দাম দিয়ে চলেছে আজও। আরও দিতে হবে তাদের। এই ঘটনার পর সেই চার জনকে ফাঁসীতে ঝোলানো হয়েছিল। পার্সনস্, ফিশার, স্পাইস আর এঙ্গেলস। এই চার শহীদ এখন অমর হয়ে বেঁচে আছেন কোটি কোটি সর্বহারাদের শরীরের মাঝে, মনের মাঝে, সমস্ত পৃথিবীতে। তাই তো মে দিবস শ্রমিকদের বড়ো আপন। এযে তাদের সহকর্মী, ভাইয়ের রক্তে রাঙানো …………

ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা মে জ্বল জ্বল করে জানান দিচ্ছিল নিজের মাহাত্ম্য।

জন্মদিনের প্রণাম সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

—বাদল কৃষ্ণ ঘোষ

বলা হয় "Failure poets are critics" অর্থাৎ কিনা যে সমস্ত কবি ও কথা শিল্পীরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে অকৃতকার্য হন, সমালোচক হন তাঁরাই। কিন্তু এ মন্তব্য যে সর্বক্ষেত্রে সমান সত্য নয় তার প্রমাণ ইংরেজী সাহিত্যের ড্রাইডেন, কোলেরীজ আর শেলীর মত বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কবি তিনি,—উপন্যাস, নাটক, গল্প, সাহিত্যের সবক্ষেত্রেই অবাধ গতি তাঁর, এবং তিনি সফলও। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ অবদানের কথা কারোরই অজানা নয়। বিশ্বের আর কোন সাহিত্যিকই আজ পর্য্যন্ত তাঁর মত সাহিত্যের সকল বিভাগে রচনা করে সফল হতে পারেননি

সমালোচনা সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য্য। এক্ষেত্রেও তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমালোচনার কথা' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা' এক্ষেত্রে প্রনিধান যোগ্য মনে করে তুলে ধরছি—"একাধারে কবি ও সমালোচক হিসাবে এতখানি প্রাধান্য ও মনন শক্তির ব্যাপকতা একমাত্র ইংরেজী সাহিত্যের ড্রাইডেন, কোলেরীজ, শেলী ও আর্ণল্ড ছাড়া পশ্চিম বিশ্বেও বড় একটা চোখে পড়ে না।" প্রাজ্ঞ সমালোচকের এই মন্তব্য অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস মাত্র নয়; এ কথাটি রবীন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যের ধারাটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা সাহিত্যে পদার্পন করেছিলেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে। তাঁর প্রথম সমালোচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী'তে বিরাট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই রসগ্রাহী ও মননশীল সমালোচনা রচনা করে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। সে সময় আরও অনেকেই সমালোচনা লেখায় প্রবৃত্ত হলেও তাঁরা সবাই ছিলেন বঙ্কিম ভাবধারায় প্রভাবিত। মৌলিকতার স্বাক্ষর বহনকারী ছিলেন না কেউই। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পরে কিছুদিন এক্ষেত্রে বঙ্কিমপ্রভাব থাকলেও নানা প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা সাহিত্যে নিজের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।

মাত্র কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমালোচনা 'ভারতী' পত্রিকায় দুবার করেন। এ সমালোচনা কিছু আক্রমনাত্মক হলেও সমালোচক যে পল্লবগ্রাহী এবং একেবারে যুক্তিহীন নন একথা বোঝা গিয়েছিল—যদিও পরবর্ত্তীকালে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর 'মেঘনাদ বধের' সমালোচনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সমালোচনা-প্রতিভার পরিচয় ইংরাজী ১৯০৪ সাল থেকেই পাওয়া যায়। ১৯০৭ সালে সংকলিত 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' তাঁর এই তিনটি সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই তিনটি গ্রন্থ থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি স্পষ্ট হয়। 'সাহিত্যে' তিনি সাহিত্যের

উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রসবিচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, "আনন্দই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য---আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।" (রবীন্দ্রনাথ-'সাহিত্যের উদ্দেশ্য') তাঁর এ উক্তির দ্বারা একথা স্পষ্ট যে সাহিত্য বিচারে তিনি বিশেষ কোন মতবাদ, দেশ প্রেম বা সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন না—এবং বোধ হয় সেই কারণে তখনকার অনেক শক্তিমান সমালোচকের, বিশেষভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ইত্যাদির বিরূপ ও রুচি বিরুদ্ধ আলোচনা ভাজন হয়েছিলেন।

'প্রাচীন সাহিত্যে' তিনি কালিদাস, বান ভট্টাদির রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' ও 'শকুন্তলা' নামক প্রবন্ধ দুটি বিশেষ আকর্ষনীয় এবং রসগ্রাহী। তিনিই প্রথম দেখালেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের সঙ্গে 'Tempest' এর আকৃতিগত মিল থাকলেও—প্রকৃতিতে দুই কাব্য দুই বিশেষ রস বহন কারী,—একের প্রকৃতি শান্ত, আর একের প্রকৃতি উদ্দাম, চঞ্চল, তিনিই প্রথম বাল্মিকী, কালিদাস, বাণভট্টের কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলা, প্রিয়ংবদাদি নায়িকাদের অন্তরের কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

'আধুনিক সাহিত্যে' সমকালীন লেখকদের রচনা আলোচিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ গ্রন্থে রবীন্দ্র নাথের মনোভাব শুধু 'আবেগ প্রবণ নয় তা যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধি বিবেচনাধীন ও বটে।

রবীন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যের একটি বিশেষ ত্রুটি রয়েছে যা তাঁর গদ্যরীতির সম্পর্কিত তা হলো পুনরুক্তির মুদ্রাদোষ ও কাব্য সৃষ্টির মোহ। তিনি একই জিনিষ বোঝাবার জন্য একাধিক উপমা প্রয়োগ করতে ভালবাসতেন; শব্দ চয়ন ও বাক্যগঠন কাব্য-ঘেঁষা হতো। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে তাঁর সমালোচনা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর।

আধুনিক সমালোচনা শুধু বিজ্ঞান কিংবা শিল্প নয়—তা বিজ্ঞান এবং শিল্প দুইই। বৈজ্ঞানিককে কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে চলে কোন জিনিষের প্রকৃতি-আকৃতির বিচার করতে হয়। এখানে নিজস্ব স্বাধীনতা নেই, অপরপক্ষে শিল্পী নিজের খেয়ালখুশী ও স্বভাবের দ্বারা শিল্প সৃষ্টি করেন। সমালোচনায় এই দুটো জিনিষের সার্থক সমন্বয় ঘটলেই তা যথার্থ সমালোচনা হয়। রবীন্দ্র নাথের সমালোচনায় এ তত্ত্বটির অভাব দেখা যায় না। তাঁর সমালোচনা বিজ্ঞান এবং শিল্প দুইই, মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে না গিয়েও তিনি মৌলিক সৃষ্টির অধিকারী। তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

উপসংহারে বলতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন অনেকদিন কিন্তু বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এরকম প্রতিভা নিয়ে আর কোন সাহিত্যিককেই আবির্ভূত হতে দেখা গেল না, যদিও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমালোচনা সাহিত্যে আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু তিনিও অকালেই চলে গেলেন, এইভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে—শুধু সমালোচনা সাহিত্যে বা কেন, সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্রুব তারাটি যা সাহিত্য সমুদ্রের নাবিকদের অনেকদিন থেকেই পথ দেখাচ্ছে।

রাত থেকে সকালে স্রেফ্‌

—রবীন দত্ত

রাত থেকে সকালে স্রেফ সময়
ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে নীল
আলো চ'লে যাচ্ছে কোল্কাতা থেকে কুড্ডালোরে
নাম পাল্টিয়ে কি যেন হ'তে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাপোলো
১৬র পেটে জন ইয়ং চ্যাঁচাচ্ছে খ'সে খ'সে গেলো চৌরাস্তায়
পাইপগান হাতে প্রমেথিউস্ সকাল থেকে সময়
দুমড়ে মুচড়ে দপ্ দপ্ করছে রগে হে অন্ধ স্বেচ্ছাধ্বনি
বুট ও বন্দুকের টেরাকোটা হে ক্রমিক কাঁটাতার
টাট টাট্…টাট টাট্…টাট্ টাট্…বা…রু… ম্‌ম্‌ম্‌ম্
বি-৫২ বোমারু বিমান হা তিন্ কোয়াং বিন্ বিন্ লিন্
থেকে শব্দ ভেঙে প্রতিশব্দে নিয়ে যাচ্ছে সকাল
হে কাঞ্চণজঙ্ঘা নারী রূপোলী ঠাসাঠাসি হে কণ্ডম্
স্কুটার খাবার পিল হে বুভুক্ষা পেনিসিলিন দুমড়ে মুচড়ে
নীল অশ্বের যাতায়াত হে ক্যালানে কার্তিক সময়
হে অন্ধ অ্যাপোলো সময় কবে হবে কবে হবে কবে হবে কবে
স্রেফ চুরমার হয়ে যাচ্ছে………

আমি মজুর

—বরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য

আমি মজুর—
বিংশ শতাব্দীর,
সত্তর দশকের
এক মজুর।
আমি হতাশার প্রতীক,
এ যুগের
শাসন ও শোষনের
মূর্ত্তিময় ব্যঞ্জনা।
...   —   ...
ক্লান্ত শ্রান্ত পদক্ষেপে
আমি চলেছি......
এ দুনিয়ার সাথে
সংগ্রামে লিপ্ত হতে।
আমার সম্মুখে ঘন কুয়াশার জাল
অক্ষম ভীরু হাতে চলেছি সেই
জাল ছিন্ন করতে।
...   .
রক্তচোষা বাদুড়ের মত এক
কয়লা খনির মালিক
ওৎ পেতে আছে বসে
আমাকে করতে গ্রাস।
শরীরের সমস্ত রক্ত জল করে দিয়ে
দু' মুঠো অন্ন পাওয়ার আশায়,
আমি চলেছি।

... ...

সেই অর্থ পিশাচ, রক্ত লোলুপ,
নেকড়ের দল
আমাকে খেতে দেবে কিনা
জানিনা !
তবুও……
আশা কুহকিনী !
প্রচণ্ড মনের জোরে,
অশক্ত, দুর্ব্বল
মেরু দণ্ডটাকে খাড়া করে
চলেছি আমি রোজগারের পথে।

... ...

ঘরে আমার রুগ্নশিশু দুটি
ক্ষুধায় কাতর,
শীর্ণা, জীর্ণা পত্নীর মুখে
হতাশার ছাপ প্রখর।
তাদের মিথ্যা স্তোক দিয়ে
খাবারের জোগাড়ে
হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে
অস্নাত অভূক্ত আমি চলেছি।

... ...

আমি মজুর
বিংশ শতাব্দীর
সত্তর দশকের
এক মজুর !

প্রশ্ন ঃ পয়লা মে

—বন্ধু

লাইব্রেরী গিয়েছিলাম
পয়লা মে'র ইতিহাসটা জানতে।
রাস্তার ওপর ছিল বালুর ট্রাক,
পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক ডজন শ্রমিক......
......এই পৃথিবীরই কোন এক শহরে
কোন এক বা কয়েক,
শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল
তাদের হাতে ধরা শান্তির দূত,
সাদা পতাকা। তার পর থেকে,
তাদের নিশানের রঙ লাল, যেন
এক আঁজলা বুকের রক্ত।......
অথচ সেই রঙের ছাপ এদের
গায়ে, চোখে, মুখে কোথাও নেই।
বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে, শুধু
সাদাটে ভাব আরও সাদা,
লেগে থাকা বালুর জন্য।
ওই বালু নিংড়োলে যদিও, এখনো
বেরিয়ে আসবে লাল রক্ত।
ইতিহাস তো অতীতের কথা,......
এই শাশ্বত মহাজীবনের ওপর
ইতিহাস লেখা কি, যে কোন,
ঐতিহাসিকের স্পর্ধাতীত হবেনা ?

প্ল্যাটফরমে ট্রেনের প্রতীক্ষায়

—জীবনময় দত্ত

প্ল্যাটফরম জনাকীর্ণ
বিদীর্ণ আমি,
ব্যস্ততা ধাক্কা হকার আর ভিখারী
এই নিয়ে প্রতীক্ষায় আছি ;
ট্রেনটা আসার সময় হয়ে গেল
নিঃশব্দ শব্দ গুলো ক্রমশঃ সোচ্চার হচ্ছে,
অথচ সময় পার করেও
সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে
ট্রেনটা এলোনা ।
আমি জীবন দত্ত প্ল্যাটফর্মে
দাঁড়িয়ে
কী নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ, নিদারুণ একাকী !

———

বঙ্গ স্মৃতি

—প্রমোদ লাহিড়ী

হে বঙ্গ জননী আমার
লহ অধমের দীন নমস্কার।
বহুঋণে ঋণী আমি, তোমা পাশে মাতঃ
কেবলি লয়েছি টানি-বিলিয়েছ যত।
ভাবিনাই কভূ কিবা সেই দান
কম কিংবা বেশী, কত পরিমাণ,
বুঝিয়াছি শুধু আমি কণামাত্র তার
জীবনে বুঝিবা তাহা নহে শোধবার।

× ×

পৃথিবীর আলো দেখেছি প্রথম,
তোমারি কোলেতে লভিয়া জনম,
তোমারি বাতাস টানিয়াছি বুকে
নয়ন মেলিয়া দেখিয়াছি তোকে,
বুঝিনাই কিছু দেখিয়াছি তোর মুখ—
হৃদে বল নাই-যবে প্রাণ ধুক ধুক।

× ×

হায় মনে পড়ে সেইদিন
যবে ভেঙ্গে তোর দেহ খান
ধর্ম্মের লাগি বিভেদ মানিল
হিন্দু মুসলমান!

একই মায়ের মোরা সন্তান
স্নেহের বাঁধনে সকলে সমান।
তবু দেখ ভাই হল ঠাঁই ঠাঁই
করি ধর্ম্মের নেশা,
ধর্ম্ম নহেক মানবিক রীতি
বিনা প্রেম ভালবাসা।

× ×

নীতির বিরোধে হয়ে পরবাসী
বিরহ তোমার বুকে বাজে বেশী,
সম্বল শুধু স্মৃতি টুকু হায়,
তবু ভোলা দায় একি বিস্ময়!
তোর স্নেহাশীষ তাই মোরে দিস,
আর কিছু নয় কিছু আর নয়।

× ×

ভূলি নাই মাগো মূরতি তোমার,
নহ তুমি ভুলিবার;
জীবনে মরণে মরমে আমার
আছো জাগ্রত অনিবার

নাটকীয়

—পার্থ সারথি মিত্র

চরিত্র—

দীপক সেনগুপ্ত	—	নাট্যদলের পরিচালক
রঞ্জন	—	„ অভিনেতা
সমর	—	„ „
অনিমেষ	—	„ „
দিব্যেন্দু	—	„ „
শৈবাল	—	„ „
ফটিক	—	„ „
ভোমলা	—	„ „ (কৌতুক)

প্রথম দৃশ্য

[একটি অতি সাধারণ রিহার্সাল রুম মানে কয়েকটা কোন ক্রমে টিঁকে থাকা চেয়ার, টেবিল, দোয়াত, কলম, ফাইল ইত্যাদির সমন্বয়। পর্দ্দা উঠলে মঞ্চে দেখা যাবে দীপক সেনগুপ্তকে, খুব চিন্তিত অবস্থায় রঞ্জন, সমর, অনিমেষ, দিব্যেন্দু ও শৈবাল পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে রয়েছেন।]

রঞ্জন — দীপকদা, এই কম্পিটিশনে আমাদের একটা নতুন কিছু নামান উচিৎ। এই……বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টারের পার্ট থাকবে। ওই ক্যারেক্টারদের সাহায্যে সমাজের ups & downs গুলোকে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হবে।

শৈবাল — দ্যুত্তোর ফিলসফি রাখ দেখি। ওসব কেউ বুঝবে এখানে? আরে শালা হিরো হিরোইনের প্রেম না থাকলে পরে, নাটক বল সিনেমা বল কিছুই জমেনা।

সমর — ওসব বাজে বক্ বক্ করছিস কেন ? বই নির্বাচন হয়ে গেছে। ভাবনা তো হচ্ছে……কিবলে গিয়ে তোদের… ক্যারেক্টার নিয়ে।

সকলে — কেন আমাদের ক্যারেক্টার খারাপ নাকিরে শালা ? তোমার মত মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করিনা।

সমর — ধ্যাত তেরি, আমি বলছি নাটকের character এর কথা আর তোরা……

দীপক — দেখ তোমাদের মনের মত সব জিনিষই এই নাটকে আছে। কিন্তু একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। (সকলের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে) একটা মেয়ে …এ্যাক্ট্রেস যোগাড় করতে হবে।

দিব্যেন্দু — য়া বা ও য়া ! আমরা আবার মেয়ে কোত্থেকে যোগাড় করব ?

অনিমেষ— মেয়ে যোগাড়ের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন দীপকদা। একজন প্রফেসনাল মেয়ে এ্যাক্ট্রেসের সাথে আমার জানা-শোনা আছে। তাকে বল্লে সে নিশ্চয়ই রাজী হবে।

শৈবাল — (কথায় টান দিয়ে) আইলেন লেডী কীলার ! প্রফেস-নাল মেয়ের সাথে জানাশোনা আছে হুঁ। এদিকে নগদ নারায়ণ তো আমাদের ক্লাবের ভাঁড়ে একেবারে Negative amount বলি ওর আসা যাওয়ার খরচটা দেবে কে ?

দীপক — তোমরা একটুতেই বড় exited হয়ে পড়। সব কিছুরই ব্যবস্থা আস্তে আস্তে হয়েই যাবে।

শৈবাল — কোত্থেকে হবে দীপকদা সব তো ট্যাঁক খালির জমিদার। নিয়ম মত চাঁদাই দেয়না। এখনো দু'মাসের চাঁদা অনেকে দেয়নি।

সমর — আচ্ছা দীপকদা, এই নারী চরিত্র টাকে বাদ দিয়ে দিলে, মানে নেপথ্যে রেখে দিলে কেমন হয়।

দীপক — উঁহুঁ বাদ দেওয়া যাবেনা সমর, এই চরিত্রটাই নাটকের centre মানে কেন্দ্র বিন্দু।

শৈবাল — কিন্তু দীপকদা, শালা এই অনিমেষটা এই খানেই যা রেলা মারছে, আসল জায়গায় গিয়ে স্রেফ চুপ মেরে যাবে। ঐ মেয়ে এ্যাক্ট্রেসের সামনে গিয়ে ও তোতলাবে, কথা বলবে কি ?

অনিমেষ — দেখ শৈবাল মুখ সামলে কথা বলবি........

শৈবাল — আরে যাযা, তোর মত কটাকে আমি এই হাটে কিনে আরেক হাটে বেচেছি......

দিব্যেন্দু — তা বেশ করেছ বাবা, এখন চুপ কর দিকি।

শৈবাল — তুই আবার কোন আকাশ থেকে চমকালি বে......

দীপক — ও এখানেই ছিল। তোমরা নিজেদের ঝগড়ায় এত ব্যস্ত দেখবার ফুরসত পাবে কোথায়। এবার তোমরা চুপ কর নইলে আমি যাচ্ছি। (চেয়ার থেকে উঠবার জন্য তৈরী হয়।)

শৈবাল — এই আমি কান মলছি দীপকদা, আমি আর কোন কথা বলবনা। কিন্তু এই অনিমেষটা যেন বেশী বক্ বক্ না করে।

দীপক — আচ্ছা ও কোন কথা বলবেনা।

(দৌড়তে দৌড়তে ফটিকের হাতে একটা কাগজ নিয়ে প্রবেশ)

ফটিক — দীপকদা, দীপকদা, তাড়াতাড়ি application টা লিখে আমার হাতে দিনতো (কাগজটা দীপকের হাতে দেবে) আমি গিয়ে চট করে ফর্মটা নিয়ে আসি। আজকেই লাষ্ট ডেট।

দীপক — ওঃ হো আমিতো আসল কাজই ভুলে গিয়েছিলাম। দাঁড়াও এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা সমর Application টা কিসে লিখলে ভাল হয় বলতো? ইংলিশে না বাংলায়?

সমর — বাংলায় লিখলেই ভাল হয় কারণ Competition টাতো বাংলা নাটকের।

শৈবাল — পচা আদার তেজ বেশী······

দীপক — আবার (একটু উঁচু গলায়)

শৈবাল — (জিভ কেটে) ইস্ এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ফটিক — ঝরে গেল······এক্কেবারে ফুলদানির শুকনো গোলাপ ফুল······

শৈবাল — দেখুন দীপকদা ফের ওরা কথা বলছে, আমি কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পারবনা বলে দিচ্ছি। জানেন আমার Temper একটু তেই গরম হয়ে যায়।

দীপক — কথা বললেই কথা বাড়ে। তুমি কেন সবখানে কথা বলতে যাও। একটু চুপ করে বসতো এবার আমি একটু Application টা লিখে নিই।

(কিছুক্ষণ সবাই নীরব। দীপক চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে লিখতে আরম্ভ করল।)

(কিছুক্ষণ পরে)

দীপক — এই নাও তাড়াতাড়ি গিয়ে ফর্মটা দিয়ে এসো তো···
(ফটিক হাত বাড়িয়ে এপ্লিকেশনটা নেয়)

ফটিক — আচ্ছা দীপকদা আমি যাচ্ছি। (ফটিকের প্রস্থান)

(ভোমলার প্রবেশ)

ভোমলা — দী···দী···দীপকদা আমি কাল বা···বা···ড়ী যাচ্ছি···

শৈবাল — বম্বে যাচ্ছিস নাকি? যা···যা···সিনেমায় চান্স পেয়ে যেতে পারিস। আর কিছু না হোক dead soldier এর ভূমিকা।

ভোমলা — না দীপকদা আমি ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি······

শৈবাল — তাই বুঝি ঝেড়ে এসেছ। তা···তা বেশ, যাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও ভালোয় ভালোয় ···

ভোমলা — দে দে···দেখুন দীপকদা, আ···আমাকে টন্ট করছে, জিয়োগ্রাফি পাল্টে দেব মুখের, সা···সা···সা···

শৈবাল — রে···গা···মা···পা···

(ভোমলা ঘুষি পাকিয়ে শৈবালের দিকে এগিয়ে যায়)

দীপক — আরে এটা কি কুস্তির আখড়া, নাকি world championship এর boxing ring।

সমর — এদের যে আপনি কেন দলে রেখেছেন দীপকদা। যেখানেই থাকবে সেখানেই একটা গণ্ড গোল বাঁধবে।

রঞ্জন — ঠিক বলেছিস, সমর···

দিব্যেন্দু— এ্যাবেসোল্যুটলি

দীপক — ঠিক শৈবাল, আর পারা যায় না। তুমি বেরিয়ে যাও ভালো ভাবে থাকতে পারলে আসবে।

শৈবাল — (রেগে) আচ্ছা শালা, সব বাপের সুপুত্তুর সাজা হয়েছে। বেরো রিহার্সাল রুম থেকে মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। (রেগে বেরিয়ে যায়)

ভোমলা — আ···আ···আ···আপদ গেল···

শৈবাল — (যেতে যেতে ফিরে এসে) আর তোমাদের বিপদ এল··· (বেরোতে যায় এমন সময় ফটিকের প্রবেশ)

ফটিক — দীপকদা হয়ে গেছে······

দীপক — form নেওয়া হয়ে গেছে বাঃ ···

ফটিক — না দীপকদা, হয়ে গেছে ··· আমাদের নাটকের last scene। last date কালকেই ছিল।

(কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ, তারপর)

সবাই — তাহলে দীপকদা হলোনা ···

দীপক — ন্ নাঃ

সবাই — তাহলে আমরা যে টাকাগুলো চাঁদা করে তুললাম সেগুলো ···

দীপক — জ ··· লে ··· গে ··· ল !

[ধীরে ধীরে যবনিকা পতন]

[গত ২৪ এপ্রিল ভারতীয় শিল্পের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হঠাৎ খসে পড়ল। যামিনী রায়ের মৃত্যু চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করল। তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু দুঃখ এই যে তাঁর তুলির যাদুস্পর্শে কাগজ আর কখনো কথা কয়ে উঠবেনা। সেই অমর 'ভারতীয়' চিত্রশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন পাটনার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল এর অধ্যক্ষ পাণ্ডেয় সুরেন্দ্র।]

পরলোকে যামিনী রায়

যামিনী রায় আজ আমাদের মাঝে নেই। বিগত ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কলকাতায় তাঁর দেহাবসান হয়েছে।

চুরাশি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার উন্নতির জন্য নিরন্তর তপস্যা করে গেছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলিয়া পুকুর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্যবহারিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে। তার পর কালিঘাটের পটে আঁকা ছবির সারল্যে তিনি খুঁজে পেলেন আপন অভিব্যক্তির মাধ্যম। লোকশিল্পের আদর্শ তাঁর সৃষ্টিতে অনুকরণ হয়ে প্রবেশ করেনি, তাঁর সৃষ্টিতে প্রধান উপজীব্য হয়েছিল। আর সেইজন্যই অভিব্যক্তির সারল্যে কখনো নিষ্ঠার অভাব হয়নি।

শিল্পে তিনি অন্তর্রাষ্ট্রীয় খ্যাতি পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে বোধ হয় খুব কমই কলাকেন্দ্র আছে যেখানে তাঁর শিল্পকৃতি উপলব্ধ নয়। বহুবার বিদেশ ভ্রমনের ডাক পেয়েও এই 'ভারতীয়' শিল্পী নিজের দেশের মাটি ছাড়তে পারেননি যদিও তাঁর শিল্প অনেক আগেই দেশের সীমা অতিক্রম করে দূর বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শ্রী রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সৃষ্টির মতই সরল অথচ নিষ্ঠা-বান ছিলেন। ধুতির আধখানা কোমরে জড়িরে আর বাকী আধখানা কাঁধে ফেলে. মেঝেতে মাদুর পেতে বসে শিল্প সাধনায় মগ্ন তাঁকে কে না দেখেছে। তাঁর হাত থেকে মুড়ি আর কলা নিয়ে খেতে খেতে বহুজনেই তাঁর শিল্প সাধনা দেখেছে। কিন্তু তা' বলে তাঁর সৃষ্টিতে কেউ কখনো অসাবধানতার লেশ মাত্র খুঁজে পাবেনা।

আজ যামিনী রায়ের পার্থিব শরীর এই পৃথিবীতে নেই। শুধু রেখে গেছেন তাঁর চিত্রকৃতি এবং তার মাধ্যমে তাঁর অপার্থিব অস্তিত্ব।

ভারতীয়তাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে, লোকশিল্পের সরল চৈতন্যস্বরূপ কে আপন করে নিয়ে যামিনী রায় চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির যে পথ প্রস্তুত করেছেন সেই পথে এখন বহু নবীন শিল্পী নিজের অভিব্যক্তির রূপ খুঁজে পাবেন। আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁকে অর্পন করি।

(হিন্দী থেকে অনুদিত)

———

[অগ্নি যুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করছেন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী স্বর্গীয় বটুকেশ্বর দত্তের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতি অঞ্জলী দত্ত।]

বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের

স্মরণে দু'টি কথা

জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই দুইটি স্বাভাবিক গতি। এই চলমান জীবন-মৃত্যু স্রোতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তাঁদের মহানকর্ম্মের দ্বারা ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে থাকেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন শ্রী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়। তাঁর জন্ম হয় অতি সাধারণ ঘরে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতবাসীর উপর ইংরেজের কি জঘন্য অত্যাচার। ইংরেজের প্রতি তাঁর মনে সেই সময় যে ঘৃণার ভাব বাসা বেঁধে ছিল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্ত করবেনই। তিনি দেশ মাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

সেই সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় আমরা দু'টী বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা দেখতে পাই—একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন অন্যদিকে সশস্ত্র

বিপ্লববাদ। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবে এসে যোগদান করলেন। তিনি একাধারে বিপ্লবী ও সাহিত্যিক। বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তক রচনা করে গেছেন কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তিনি বিপ্লবী। বিপ্লবীদের চরিত্রে যে অসম সাহসিকতা, অদম্য উৎসাহ ও নির্ভিকতা দেখতে পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে এ সবগুলিরই সমাবেশ আমরা দেখতে পাই। তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সক্রিয় সহকর্মী ও বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স বিপ্লব দলের অন্যতম নেতা ছিলেন।

এই সময়ে দেশের মধ্যে একদিকে অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যদিকে বিপ্লববাদ এই দুইটি বিভিন্ন মুখী আন্দোলনের ফলে দলে দলে লোক জেলে যেতে থাকে। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় মহাশয়ও বহু বার কারা বরণ করেন। কিন্তু ইংরেজ বাহাদুর দুই শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি দু'রকম ব্যবহার করত। অসহযোগ আন্দোলন কারীদের, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে মেনে নেওয়াহল ও তাঁদের জেলে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হ'ল কিন্তু বিপ্লবীদের চোর, ডাকাতদের পর্য্যায়ে ফেলে এঁদের উপর এমন নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার করা হ'ত যা কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে বিরল।

বিপ্লববাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও কঠোর সাধনার পথ। যাঁরা সাধু অথবা সন্ন্যাসী তাঁরাতো নিজের আত্মার মুক্তির জন্য কঠোর সাধনা করেন কিন্তু এঁরা? এঁরা দেশমাতৃকার মুক্তি, দেশের কোটি কোটি বুভূক্ষু জনতার মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

তাই এঁদের সাধনা আরও কঠোর, ব্যাপক ও মহান। ভূপেন্দ্র কিশোর ও তাই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হ'ল। দেশের ভিতরের আন্দোলন ও বিশ্বের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপে পড়ে ইংরেজ কংগ্রেসের হাতে স্বাধীনতা তুলে দিল। কিন্তু নিপীড়িত, নির্য্যাতীত এই সব বিপ্লবী-যাঁরা কোন রকমে বেঁচে গেলেন বৃটিশের কবল থেকে তাঁরা কি দেশের কাছ থেকে কোন স্বীকৃতি পেলেন?

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ও কোন স্বীকৃতি পেলেননা। কোন পার্থিব সুখ পেলেননা। অবশেষে এই বছরই ২৪শে এপ্রিল কলকাতার কারনানী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য্য কোন মানুষকে অমর করতে পারেনা—মানুষ অমর হয় তার মহান কর্ম্মের দ্বারা। তাই ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে রইল। তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদেরই সৃষ্ট শ্লোগান দিয়ে শেষ করি "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

"...'৭২ এর মধ্যেই ভিয়েৎনাম মুক্ত হবে"

'কিছুক্ষণ'—শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকারের সঙ্গে

প্রশ্ন—ভিয়েৎনাম ও বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের চরিত্রগত মিল ও অমিল সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

—সোজাকথায়, একমাত্র আদর্শগত মিল ছাড়া এই দুই দেশের মুক্তি যুদ্ধে আর কোন মিল নেই। ভিয়েৎনাম ও বাংলা দেশ—দুজনেই স্বাধীনতার জন্য ক্রমশঃ যুদ্ধ করছে এবং করেছে। ব্যস, এই পর্য্যন্তই। তবে ভিয়েৎনামের লড়াই চলছে অনেকদিন থেকে, সেই ১৯৪৫ সাল থেকে, আর বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধ তো মাত্র কয়েক মাসের। তাছাড়া ভিয়েৎনামের লড়াই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান

'The Searchlight' এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সমীর রঞ্জন মজুমদার ও পার্থ সারথি রায় এর সাক্ষাৎকারের সারাংশ প্রশ্নোত্তর রূপে দেওয়া হল।

শক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে আর বাংলাদেশের লড়াই ছিল পৃথিবীর এক অতি দুর্ব্বল দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আর ভারত বাংলাদেশকে যে রকম প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে সেরকম সাহায্য ভিয়েৎনামকে চীন বা রাশিয়া কেউই করেনি। অন্ততঃ আজ (৯।৫।৭২) পর্য্যন্ত নয়।

প্রশ্ন—ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বর্ত্তমান পর্য্যায়ই কি শেষ পর্য্যায় ? এ যুদ্ধ কত দিনে শেষ হবে বলে আপনি মনে করেন ?

—আমার মনে হয় '৭২ এর মধ্যেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসান ঘটবে। অর্থাৎ ভিয়েৎনাম মুক্ত হবে।

প্রশ্ন—ভিয়েৎনাম মুক্তিযোদ্ধারা বর্ত্তমান সময়টাকেই কেন আক্রমণের উপযুক্ত সময় বলে মনে করল ?

— পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মুক্তি বাহিনী বা বিপ্লবী বাহিনী পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর আক্রমণ চালায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমেরিকার মত প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ যদি তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামে তাহলে মুক্তিবাহিনীর জয় অসম্ভব। আমেরিকায় এখন সামনেই প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন। জনমত এখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাই মিঃ নিক্সন চাইলেও নির্ব্বাচনে হারবার ভয়ে যুদ্ধকে জোরদার করতে পারবেন না। আর এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্ব্বাত্মক আক্রমণ হেনেছে বিপ্লবী বাহিনী।

প্রশ্ন—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবী হটাও' স্লোগান সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

—উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। তবে মুস্কিল এই যে যাঁদের উপর এই কাজের ভার তিনি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে খুব অল্পজনেরই এতে বিশ্বাস এবং আস্থা আছে। সেজন্য 'গরীবী হঠাও' যে কতদূর সফল হবে বা আদৌ সফল হবে কিনা তা বলা যায় না।

প্রশ্ন—ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি সমস্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান কি বর্ত্তমান set up এর মধ্যে সম্ভব ? এই দুইটি প্রধান সমস্যার মোকাবিলার জন্য কোন পন্থা গ্রহণ করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

—আমার মতে ভূমি সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। গভর্ণমেন্ট শিক্ষা ও সুস্থজীবনযাপনে জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়। Land Ceiling এর প্রস্তাব অর্থহীন—Farce। এর জন্য Agricultural Income Tax এর প্রবর্ত্তন করলে অনেক আগেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। Estate Duty Act ঠিকমত চালু করলেও এ বিষয়ে অনেক সুরাহা হত। আর বেকার সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব হবে যখন দেশে প্রভূত সংখ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে। অনেক সংখ্যায় শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হলেই গভর্ণমেন্ট বাধ্য হবে এই সমস্যার সমাধান করতে। না হলে তাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবে নতুন নেতা। এর জন্য দেশের অবহেলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন—পশ্চিম বঙ্গের বিগত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? শ্রী জ্যোতি বসুর আসন্ন বিদেশ সফর আপনি কি দৃষ্টিতে দেখছেন?

—আমাদের দেশে ইলেকশন ওই রকমই হয়ে থাকে। ওর থেকে ভাল আশা করা যায় না। প্রত্যেক দলই বোগাস ভোট দিয়ে থাকে তবে কে কত দিল বলা মুস্কিল। তবে, নির্ব্বাচন যেভাবেই হোক না কেন সি০ পি০ এম হারতোই, তাদের Incorrect Political Steps ও Incorrect Ideologyর জন্য। কোন দলই Negative Attitude নিয়ে নির্ব্বাচনে জিততে পারে না। যদিও এর দরকার আছে। বিশেষ করে বিরোধী দলের পক্ষে। কিন্তু

সি° পি° এম শাসন ক্ষমতায় এসেও এই Attitude ত্যাগ করে Positive attitude গ্রহণ করেনি, তাই তার এই পরাজয়।

জ্যোতি বসুর বিদেশ সফরে কোন লাভ হবেনা। তিনি যাঁদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করবেন তাঁরা হয়তো তাঁর বক্তব্য শুনবেন কিন্তু তাঁরা কিছুই করবেন না, করতে পারবেন না।

প্রশ্ন—বাংলা ভাষায় যে সব ছোট ছোট পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

—পত্রিকা বা'র হওয়া ভাল। এটা একটা খুব ভাল Initiation। তবে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে পত্রিকা যেন Continue করে। ছাত্রদের মধ্যে এ ধরণের মনোবৃত্তি কে আমি সবসময় সমর্থন করি। তবে পত্রিকার বিষয় বস্তুতে লেখকদের নিজস্ব বক্তব্য বেশী করে থাকা উচিৎ।